ইতিহাসের পাতা

মুতার ঐতিহাসিক যুদ্ধ এবং তিন শহীদ সেনাপতি

মাহদি হাসান

August 9, 2020

8 MIN READ

অষ্টম হিজরির জুমাদাল উলা মোতাবেক ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট।

আরবের মরুভূমির কোল থেকে মুতার রণক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছেন তিন প্রকৃত বীর। তিন হাজার সাহাবীর সমন্বয়ে গঠিত ছোট একটি সৈন্যদল নিয়ে তারা ছুটেছেন মদিনা থেকে উত্তরে সিরিয়ার দিকে। লক্ষ্য তাদের রোমান সাম্রাজ্যের বিশাল বাহিনীর মোকাবেলা করা। যে বাহিনী প্রকৃত অর্থেই বিশাল। তাতে রয়েছে প্রায় দুই লক্ষ সৈন্য। এই বিশাল বাহিনী বেরিয়েছে তিন হাজার সাহাবার ক্ষুদ্র বাহিনীকে কচুকাটা করার জন্য। অথচ এই ক্ষুদ্রবাহিনীই বিজয় লাভ করেছিল সেই বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে। পৃথিবীর ইতিহাসে সেদিন ঘটেছিল এক অভূতপূর্ব ঘটনা। কিন্তু সেই ঐতিহাসিক বিজয় অর্জিত হয়েছিল তিন মহাবীরের শাহাদাতের বিনিময়ে। তারা জিহাদ ফি সাবিল্লিল্লাহর জন্য অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছিলেন নিজেদের প্রাণ। সেই তিন বীরের নাম যায়েদ বিন হারেসা, জাফর বিন আবু তালেব এবং আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা রাযিয়াল্লাহু আনহুম।

যায়েদ বিন হারেসা (রাঃ)। রাসুলের প্রিয় পালকপুত্র। উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) এর সম্মানিত পিতা। যাকে ডাকা হতো যায়েদ বিন মুহাম্মাদ তথা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুত্র বলে। নিজ পিতা-মাতাকে ছেড়ে প্রিয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই মেনে নিয়েছিলেন নিজের পরম আশ্রয় হিসেবে। সর্বপ্রথম যারা ইসলামের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন তিনি তাদের একজন। জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত সাহাবীগণের মধ্য হতে তিনি একজন। রাসুলের প্রেরিত সারিয়্যার সর্বপ্রথম সেনানায়ক তিনি। তিনিই একমাত্র সাহাবী যার নাম পবিত্র কুরআনুল কারীমে হয়েছে বর্ণিত।

জাফর বিন আবু তালিব (রাঃ)। যিনি জাফর তাইয়্যার নামেই সুপরিচিত। রাসুলের চাচাতো ভাই। আলি (রাঃ) এর সহোদর ভ্রাতা। তিনি ছিলেন হাবশায় অবস্থানরত মুহাজির মুসলিম কাফেলার আমির। নাজ্জাসীর সম্মুখে ইসলামের শ্বাশ্বত সৌন্দর্য বর্ণিত হয়েছিল তারই উচ্চারণে।

আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা। রাসূলের কবি। আনসারী সাহাবাগণের মধ্যে অগ্রগন্য একজন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সম্পর্কেবলেছেন, ‘আল্লাহ তা’আলা দয়া করুন আবদুল্লাহ বিন আবু রাওয়াহার প্রতি। নিশ্চয়ই তিনি সেই মজলিসসমূহকে পছন্দ করেন, যা নিয়ে গর্ব করেন ফেরেশতাগণ’।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আজদ গোত্রের বীর সাহাবী হারিস বিন উমাইর আল-আজদিকে দিয়ে বুসরার গভর্নরের কাছে পাঠিয়েছিলেন সম্প্রীতির বার্তাবাহী চিঠি। এখান থেকেই শুরু হয় মুতার যুদ্ধের প্রেক্ষাপট। বুসরার উদ্দেশ্যে যাত্রাকালে পথিমধ্যে খ্রিষ্টান গাসসানিদের রাজা শুরাহবিল বিন আমর হত্যা করে ফেলে রাসূলের এই দূতকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি এই ঘটনায় হন তীব্র আহত। অবিলম্বে তিন হাজার সাহাবীর সমন্বয়ে গঠিত বাহিনীকে নির্দেশ দেন ঘাতক শুরাহবিলকে উচিত শিক্ষা দেয়ার জন্য। এই বাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করেন তার প্রিয়পাত্র যায়েদ বিন হারিসা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে। বলে দেন, ‘যদি যায়েদ শহীদ হয়, তবে সেনাপতি হবে জাফর। জাফর নিহত হলে সেনাপতি হবে আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা’। অতঃপর তিনি যায়েদ বিন হারেসার হাতে তুলে দেন ইসলামি বাহিনীর শুভ্র পতাকা। রাসুল তাদেরকে কোমলস্বরে উপদেশ দেন, ‘তোমরা আল্লাহ তায়ালার নামে একনিষ্ঠভাবে তাঁরই রাহে যুদ্ধ করবে। বিশ্বাসঘাতকতা এবং সীমালঙ্ঘন যেন না হয়। কোনো শিশু এবং মহিলাকে যেন হত্যা না করা হয়। কোনো বৃদ্ধের গায়ে যেন আঘাত করা না হয়। কোনো ইবাদতগাহে যেন ধ্বংসের আঁচড় না লাগে। কোনো বৃক্ষের গায়ে যেন না লাগে অস্ত্রের আঘাত। কোনো স্থাপনাকে যেন না করা হয় বিচূর্ণ’।

মুসলিম যোদ্ধাদের স্ত্রীগণ বেরিয়ে আসেন বিদায় জানাতে। আপন আপন স্বামীর উদ্দেশ্যে কোমলস্বরে বলেন, ‘আল্লাহ আপনাকে ধৈর্যের সহিত আবার আমার কাছে ফিরিয়ে আনুন’। তখন এক বীরপ্রাণ তার স্ত্রীর জবাবে বলেন, ‘আল্লাহ তা’আলা

আমাকে যেন আর ফিরিয়ে না আনেন’। সেই বীরপ্রাণ সাহাবী ছিলেন আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা।

বর্তমান জর্ডানের উপকূলীয় শহর মা’আনের অধিগত ‘মুতা’ নামক স্থানে মুসলিম বাহিনী মুখোমুখি হয় রোমীয়দের। রোমীয় সৈনিকদের নেতৃত্বে ছিল তাদের রাজা হিরাক্লিয়াস নিজেই। প্রায় দু লক্ষ সৈন্য এসেছে মাত্র তিন হাজার মুজাহিদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য। বিশাল এই বাহিনী মুসলিমরা বসে যান পরামর্শে। যুদ্ধ করবেন নাকি ফিরে যাবেন এ নিয়ে হয় আলোচনা। বীরপ্রাণ আবদুল্লাহ বিন আবু রাওয়াহা দৃঢ়চিত্তে বলেন জিহাদ চালিয়ে যাওয়ার কথা। অবশিষ্ট সাহাবায়ে কেরামের রক্তেও উন্মত্ত হয়ে উঠে জিহাদের তরঙ্গমালা। অবশেষে তারা ধরাশয়ী করেন রোমীয়দের সেই বিশাল বাহিনীকে।

বেজে উঠে যুদ্ধের দামামা চারদিকে। রণক্ষেত্রের বিক্ষিপ্ত ধূলিকনা জানান দিতে থাকে তীব্র উত্তেজনার। কান পাতলেই শোনা যায় অস্ত্রের ঝনঝনানি। তার বুক চিড়ে ভেসে মুসলিম মুজাহিদগণের আল্লাহু আকবার ধ্বনি। অথবা তাদের দরাজ কণ্ঠের তেজোদ্দীপক কোনো পংক্তি। যা তাদেরকে করে তোলে উজ্জীবিত। সেনাপতি যায়েদ বিন হারিসা ছিলেন এ যুদ্ধের প্রথম শহিদ। তার শাহাদাতের পর ইসলামি বাহিনীর পতাকা হাতে তুলে নেন আরেক সেনাপতি জাফর তাইয়্যার। পবিত্র পতাকার গায়ে তিনি লাগতে দেননি ধূলির আঁচড়। অতঃপর হিংস্র সিংহের মতো তিনি কচুকাটা করতে থাকেন রোমীয় সৈন্যদের। তারা কেটে ফেলে জাফর তাইয়্যারের ডান হাত। তিনি বামহাতে আঁকড়ে ধরেন। অতঃপর বাম হাত কেটে ফেলে তারা। তিনি দুই বাহু দিয়ে ধরে রাখেন পতাকা। পবিত্র পতাকাকে তিনি হতে দেননি ভূপতিত। শত্রুরা এবার তির বিদ্ধ করে তাঁর হৃৎপিণ্ডে। তিনি ঢলে পড়েন শাহাদাতের সুখনিদ্রায়। অতঃপর পবিত্র পতাকার গায়ে মাটির স্পর্শ লাগার আগেই তা হাতে তুলে নেন রাসূল ঘোষিত অপর সেনাপতি আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা। তিনি দরাজ কণ্ঠে প্রাণখুলে তখন গাইছিলেন,

‘ওহে আমার নফস, শহিদ যদি না হও তুমি তবে যাও মরে
উপনীত হয়েছ তুমি আজ মৃত্যুকূপের দ্বারে,
তোমার প্রত্যাশার সাথে হয়েছে তোমার সাক্ষাৎ
তাই প্রত্যাশিত কাজ আঞ্জাম দাও শীঘ্রই, তবেই হবে শান্ত
বিলম্বে তুমি হবে দুর্ভাগ্যে আক্রান্ত’।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এর সূত্রে সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে, ‘সেদিন নিহত জাফর তাইয়্যারের কাছে এসে তাঁর শরীরে পঞ্চাশটি তির এবং তরবারির আঘাত গণনা করেছি। এর সবকটিই ছিল সম্মুখ দিকে। পিছন দিকে কোনো আঘাত ছিল না’। (১)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে উৎকৃষ্ট সনদে মুস্তাদরাকে হাকিম এবং তাবারানিতে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘আমি জাফর বিন আবু তালিবকে জান্নাতের ফেরেশতাদের সাথে দেখেছি। তার পা দুটো রক্তে রঞ্জিত আর সে জান্নাতে উড়ে বেড়াচ্ছে’। (২)

জাফর তাইয়্যারের মৃত্যুর পর বীরদর্পে যুদ্ধ করে জান্নাতের সঙ্গী হয়ে যান আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ)।

আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহার মৃত্যুর পর পতাকা হাতে তুলে নেন প্রসিদ্ধ সাহাবী বদরের যোদ্ধা সাবিত বিন আকরাম (রাঃ)। তিনি বলেন, ওহে মুসলিম যোদ্ধাগণ, ভালো হয় আপনারা একজন সেনাপতি ঠিক করে নিন। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আপনার হাতেই থাকুক পতাকা। তিনি বললেন, আমি এ কাজের নই যোগ্য। অতঃপর তিনি এগিয়ে যান বিস্ময় বীর খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) এর দিকে। তার হাতে তুলে দেন ইসলামি বাহিনীর পতাকা। তাকে বলেন, যুদ্ধের ব্যাপারে আমার চেয়ে অভিজ্ঞ আপনি। খালিদ (রাঃ) এর ইসলাম গ্রহণের বয়স তখন মাত্র তিন মাস। তিনি বিনতস্বরে বলেন, আমার চেয়ে অধিক উপযুক্ত আপনিই। আপনি বদরের একজন গর্বিত মুজাহিদ।

সাবিত (রাঃ) তখন মুসলিম মুজাহিদগণকে একত্রিত করে খালিদ (রাঃ) হাতে তুলে দেন। পতাকা হাতে তুলে নিয়ে খালিদ (রাঃ)

ঝাপিয়ে পড়েন রণাঙ্গনে। এমন যুদ্ধ করেন যাতে হয়ে বিগত বিশ বছরের কাফফারা।

আল্লাহর রাস্তায় এটিই ছিল তাঁর প্রথম যুদ্ধ। তাই আল্লাহর জন্য তিনি প্রদর্শন করেছিলেন একনিষ্ঠ সাহসিকতা এবং বীরত্বের মহড়া। সেদিনকার মতো লড়াই তিনি কখনো করেননি আগে। সহিহ বুখারিতে বর্ণিত আছে, খালিদ (রাঃ) বলেছেন, 'মুতার যুদ্ধের দিন আমার হাতে নয়টি তলোয়ার ভেঙ্গেছে। অতঃপর আমার হাতে কেবল একটি ইয়ামানি খঞ্জরই অবশিষ্ট ছিল'। (৩)

নয়টি তলোয়ারই ভেঙ্গে গিয়েছিল যখন, কল্পনা করুন এই নয় তরবারির আঘাতে কত শত্রুর প্রাণবধ করেছিলেন তিনি! একের পর এক তলোয়ার পাল্টে তিনি যুদ্ধের ময়দানে থেকেছিলেন অটল। বীরদর্পে করে গেছেন লড়াই। তাকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছে ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনীর অবশিষ্ট সাহাবীগণ।

এ অবস্থাতেই যুদ্ধ চলেছিল পূর্ণ একদিন। মুসলিম মুজাহিদগণ এক মুহূর্তের জন্যও রণে ভঙ্গ দেননি। রোমীয়দের বিশাল সেনাবাহিনীর প্লাবনের সম্মুখে তারা ঠায় দাঁড়িয়েছিলেন দুর্ভেদ্য প্রাচীর হয়ে। যুদ্ধ চলতেই চলতেই অন্ধকার হয়ে আসে আকাশ। এগিয়ে আসে সূর্যাস্তের পালা। সকাল থেকে নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত দুই লক্ষ সৈন্যের বিপরীতে তিন হাজার সৈন্যের লড়াই এবং রণক্ষেত্রে চালকের আসনে থাকার মতো বিস্ময়কর অবস্থা আপনি কি কখনো কল্পনা করতে পারতেন?!

খালিদ রাঃ এর অভূতপূর্ব রণকৌশল

সে সময় রাতে যুদ্ধ করার প্রচলন ছিল না। তাই রোমীয়রা সে রাতে বিশ্রামের জন্য ফিরে যায় নিজ নিজ তাবুতে। কিন্তু মুসলিম যোদ্ধাগণ নিজেদের গায়ে লাগতে দেননি বিশ্রামের ছিটেফোঁটা। তারা ছটফট করছিলেন অস্থিরতায়। খালিদ বিন ওয়ালিদ তাঁর বাহিনী নিয়ে নিরাপদ অবস্থানে যাওয়ার জন্য পরিকল্পনা করতে থাকেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সেই নিরাপদ অবস্থানে মুসলমানদের জন্য অনেক সাহায্য এসেছে, এমনটি শত্রুদের মনে ঢুকিয়ে দেয়া। ফলে রোমীয়দের অন্তরে সৃষ্টি হবে ত্রাস। কারণ গতকাল তিন হাজার সৈন্যের সাথে যুদ্ধ করেই তারা জেনে গেছে মুসলিম মুজাহিদগণের ক্ষমতা। এখন তাদের সাহায্য এলে রোমীয়দের কী পরিণতি হবে! এই ভেবে তারা হয়ে পড়বে কুণ্ঠিত।

এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তিনি কয়েকটি কৌশল গ্রহণ করেন।

(১) সারা রাতধরে তিনি মুসলিম বাহিনীর ঘোড়াগুলো দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ঘন ধুলোবালি উড়াতে থাকেন। যাতে করে রোমীয়রা বুঝতে পারে মুসলমানদের জন্য বিরাট কোনো সাহায্য এসেছে।

(২) তিনি সেনাবাহিনীর বিন্যাস পাল্টে ফেলেন। মাইমানা তথা ডানভাগকে বানিয়ে ফেলেন মায়সারা তথা বামভাগ। মায়সারাকে বানিয়ে ফেলেন মাইমানা। এমনিভাবে অগ্রভাগকে নিয়ে যান পিছনে আর পিছনভাগকে নিয়ে আসেন অগ্রে। সকালে উঠে মুসলিম বাহিনীর এই পরিবর্তিত অবস্থা প্রত্যক্ষ করে রোমীয়রা নিশ্চিত বিশ্বাস করে নিবে মুসলমানদের জন্য নিশ্চয়ই বিরাট সাহায্য এসেছে। তাদের মনোবলের প্রাসাদ আস্তে আস্তে পড়বে ধ্বসে।

(৩) তিনি বাহিনীর শেষভাগে বেশ দূরত্বে একটি টিলার পিছনে রেখেছিলেন রিজার্ভবাহিনী। সেখানে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে তাদের একমাত্র কাজ ছিল ধূলি উড়ানো। যাতে রোমীয়রা মনে করে মুসলমানদের জন্য লাগাতার সাহায্য আসছেই। এই ভেবে তাদের মনে ত্রাস আরো ঘনিভূত হতে থাকবে।

(৪) পরবর্তী দিন রণাঙ্গনে খালিদ বিন ওয়ালদি (রাঃ)মুসলিম বাহিনীকে নিয়ে আস্তে আস্তে করে পিছিয়ে মরুভূমির গভীরে যেতে থাকেন। এ দেখে রোমীয়রা মনে করে খালিদ তাদেরকে মরুভূমির মাঝে নিয়ে কোনো ফাঁদে ফেলতে চাচ্ছে হয়তো। তাই মুসলিম বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবনে দ্বিধাবোধ করতে থাকে। সেদিন মুসলিম বাহিনীকে পিছিয়ে যেতে দেখেও তারা পিছু হামলার দুঃসাহস করতে পারেনি।

মুতার সেই ঐতিহাসিক যুদ্ধে শহিদ হয়ে যান তিন মহাবীর। তাদের সাথে শহীদ হন আরো নয়জন বীরপ্রাণ সাহাবী। ঐতিহাসিক এই যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করেছিলেন এই বারোজন সাহাবীই। অপরদিকে মুসলিম মুজাহিদগণ রোমীয়দের হাজার হাজার সৈন্য কচুকাটা করে ছিনিয়ে এনেছিলেন বিজয়। যে বিজয় এসেছিল আল্লাহর তরবারি খালিদ বিন ওয়ালিদের হাত ধরে।

——-

(১) সহিহ বুখারী, ৪০১২।
(২) কানযুল উম্মাল,৩৩২০৫।
(৩) সহিহ বুখারিঃ৪০১৭।